এখনো কিংবদন্তী
ছেঁড়া গেঞ্জি
ভাঙা সুটকেস
তারপর বাইশ বছর

এখন জিয়া পরিবার

বিতর্কের উর্ধ্বে ছিলেন না জিয়াও। সমালোচনা ছিল রাজনৈতিক বিভিন্ন সিদ্ধান্তে, নিন্দিত হয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে জামায়াত শিবিরকে প্রশয় দেবার জন্য। তারপরও তার আলাদা একটি ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছিল। সেটি ব্যক্তি সততার। বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিরল এই প্রতিকৃতির উত্তরাধিকারীরা দীর্ঘ ২২ বছর পর সেই সততার কিভাবে মূল্যায়ন করছেন জনগণের সামনে নিজেদের কার্যক্রমের মাধ্যমে...

পুরনো স্লিপিং স্যুট, ছেঁড়া গেঞ্জি, ভাঙা স্যুটকেস বিষয়গুলো কিংবদন্তির পর্যায়ে চলে গেছে। মৃত্যুর পরে একজন রাষ্ট্রপতির উল্লেখযোগ্য সম্পদের মধ্যে যখন এগুলো পড়ে তখন বিস্মিত হতেই হয়। এ বিস্ময় বর্তমান প্রজন্মের কাছে অনেক বেশি। দেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের ইমেজ এখন যা তা এমন উদাহরণকে কাল্পনিক বললেও কম বলা হয়। অথচ বাইশ বছর আগে এমনটি ছিল না। একজন রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত সততা সেই পর্যায়ে বিশ্বাসযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য ছিল।

১৯৮১ সালের ৩০ মে নিহত হবার পর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রচ্ছদ কাহিনী প্রকাশিত হয় এবং লক্ষ কপি ছেপে চাহিদা মেটাতে পারেনি। মানুষ আরো জানতে চাইতো। জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক

মতাদর্শ নিয়ে বিতর্ক ছিল, সমালোচনা ছিল তার বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণ বিষয়েও। কিন্তু তিনি মোটামুটি বিতর্কের ঊর্ধ্বে ছিলেন ব্যক্তি সততার প্রসঙ্গে। সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত একজন সামরিক অফিসার সর্বোচ্চ ক্ষমতায় এসে সরে দাঁড়াননি সততার আসন ছেড়ে। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার এমন আচরণ কাছের মানুষদেরও অস্বস্তিতে ফেলতো। মন্ত্রী, সরকারি কর্মকর্তারা এ কারণে অনেক বেশি তটস্থ থাকতেন। বিদেশে রাষ্ট্রীয় সফর শেষে ফেরার পথে প্রেসিডেন্টের সফর সঙ্গীদের বিপদে পড়তে হয় রঙিন টিভি ও অন্যান্য বিলাস সামগ্রী সঙ্গে আনার অপরাধে। এখনও রাষ্ট্রীয় সফর হয়। সরকার প্রধান চার দলীয় নেতা-কর্মী আর আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে বিমানের আসন পূরণ করেন। আর দেশে ফিরে আসেন কি নিয়ে তা দেখতে চাওয়া তো দুঃসাহসের কথা, এ নিয়ে প্রশ্ন করাই তো রীতিমতো বেয়াদবির পর্যায়ে চলে যায়।

এদের সঙ্গে সঙ্গে যেন 'হত্যা' হয়েছে সততা, আত্মত্যাগ বলে শব্দগুলো। টাকার কাছে পরাজিত রাজনীতি। আর যখন পরাজিত হয় জিয়া পরিবার বা তাদের হাতে 'হত্যা' হয় পিতার ভাবমূর্তি, তখন আক্ষেপের শেষ থাকে না। জিয়ার উত্তরাধিকারীরা শাসন করে হাওয়া থেকে ধরা তলে। দাঁড়াতে পারে না পিতার সত্যিকারের উত্তরাধিকারিত্বে। পারে না বাংলাদেশের 'নিয়তিকে' অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতে

পুরনো স্লিপিং স্যুট বা গেঞ্জির ব্যাপারটি লোক দেখানো বা ব্যক্তি উপার্জনের সীমাবদ্ধতার জন্য নয়। একজন সংবাদিককে বলেছিলেন, তিনি ঘুমানোর জন্য কুর্তা বা স্লিপিং স্যুট যত পুরনো হবে তত আরাম। অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিনি প্রপার ড্রেসড থাকতেন এবং সহকর্মীদের ক্ষেত্রেও ছিলেন ফর্মাল। কম কথা বলতেন, শুনতেন অন্যের কথা মনোযোগ দিয়ে। স্বল্পাহারী, পরিশ্রমী মানুষটিকে নিয়তি যেন ক্ষমতার শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিল। ২৫ ও ২৬ মার্চে অসহায় মানুষ নির্বিচারে প্রাণ দিচ্ছে তখন সেই মরণাতঙ্কের দোজখের অন্ধকারে শোনা গেল, 'আমি মেজর জিয়া বলছি।'

যেন নিয়তির কণ্ঠস্বর। মানুষ উঠে দাঁড়ালো।

বঙ্গবন্ধু হত্যার আগেই মোশতাক শাসনে যখন দেশবাসী চলে যাচ্ছে এক অনিশ্চয়তার দিকে তখন ব্রিগেডিয়ার খালেদ ও শাফায়েত জামিল রুখে দাঁড়াতে গিয়ে পাল্টা আঘাতে পতন ঘটলো। সামরিক বাহিনী হঠাৎ বেসামাল হয়ে পড়লো। এই ভয়াবহ মুহূর্তে আবার শোনা গেল, 'আমি মেজর জেনারেল জিয়া বলছি'।

নিয়তি নিয়ে এলো রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার রক্ত পিছল পথে। কিন্তু জেনারেল নিজে গায়ে রক্তের ছাপ নিলেন না বা লাগলো না।

এখানে হয়তো ইতিহাসের অজ্ঞাত অধ্যায় আছে, আছে কিন্তু কালো বা সাদা পাতা। কিন্তু ইতিহাস ব্যাখ্যাকারীরা প্রমাণাদিসহ অন্য কিছু বলতে পারেননি।

এ লেখা জেনারেল জিয়ার মৃত্যুর মাসের প্রস্তুতিগাথা নয়। প্রেসিডেন্ট জিয়ার অনেক কাছের বন্ধু তাকে ইমোশনহীন সচেতন নিষ্ঠুর ব্যক্তি মনে করতেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়ার ব্যক্তিগত বন্ধু কর্নেল তাহেরের ফাঁসি হলে তিনি ক্ষমা করেননি। শত শত সৈনিকের ফাঁসির আদেশে তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন। তার বক্তব্য: সেনাবাহিনীকে বাঁচাতে হবে অরাজকতা থেকে।

জিয়া বিতর্কিত ছিলেন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য। 'আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর দ্য পলিটিশিয়ান্স' উক্তিটি অসংখ্য বিতর্কের একটি। আসলেও জিয়া রাজনীতিবিদদের অনেক কষ্টের মধ্যে রেখে গেছেন। রাজনীতিকে ডিফিকাল্ট করে গেছেন। রাষ্ট্রপতিকে এতো কাছে থেকে দেখা যেতে পারে দেশের মানুষকে তা সম্ভব করে দেখিয়েছিলেন তিনি। খাল কাটা কর্মসূচির কারণে তিনি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। খাকি প্যান্ট আর সাদা হাফ হাতা স্যান্ডো গেঞ্জি পরা প্রেসিডেন্টের হাতে মাটি কাটার কোদাল জনগণকে বিস্মিত করে রেখেছিল। মানুষ দেশ গড়ার নতুন স্বপ্নে তখন আলোড়িত। এমন কয়েকটি উদ্যোগ জিয়াকে নিয়ে যায় ভিন্ন স্তরে। গড়ে ওঠে নিজস্ব ভাবমূর্তি। মাত্র চার বছর ক্ষমতা ও রাজনীতির মধ্যে থেকে তিনি সেই ধারা তৈরি করেছিলেন। যা প্রচলিত রাজনৈতিক ধারা পেছনে ফেলে দিতে পেরেছিল। অবশ্য কোনো কিছুই পরিকল্পনাহীনভাবে হয়নি। সাতাত্তরের ২১ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি হবার আগ থেকেই তিনি বুঝেছিলেন আওয়ামী বিরোধী একটি স্রোতধারা তৈরি করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধা এবং ঘাপটি মেরে থাকা পুরনো মুসলিম লীগের ও বিভিন্ন গ্রুপের সমন্বয়েই এমন প্লাটফরম তৈরি করতে চেয়েছিলেন তিনি। লক্ষ্য পূরণে তিনি সফলও হয়েছিলেন। জামায়াত-শিবিরকেও এই প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনায় শামিল করে দেশকে পিছিয়ে নিয়ে যান। এই কারণে তাকে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের মুখে পড়তে হয়। সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছিলেন মন্ত্রিসভায় কয়েকজন বিতর্কিতদের স্থান করে দেয়ার জন্য। মুক্তিযোদ্ধা জিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাজাকার শাহ আজিজুর রহমানের নাম কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। একাত্তরের ঘাতক মওলানা মান্নানকে আনেন মাদ্রাসাকে হাতে আনার জন্যে। একাত্তরের পাকিস্তানি সহযোগী শর্ষীনার পীরকে জাতীয় সম্মান প্রদান করেন।

এখানে জিয়া আমলে শেষের দিকে ক্রমে তৈরি হয়ে এসেছিল বিভিন্ন শক্তিবলয়। যেমন এসময় উত্থান ঘটে ঋণখেলাপি কালচার। তৈরি হতে থাকে বিভিন্ন মাস্তান সিবিএ সংগঠন। বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও অন্যান্য ইউনিটগুলো। এই মাস্তানদের দখল দেয়া শুরু হয় বাস টার্মিনাল ও লঞ্চ ঘাট, হাটবাজার। সবচে' বড় অভিযোগ ওঠে বহু রাজনৈতিক ব্যক্তিকে রাজনীতিতে আনেন বা বসিয়ে দেন লেনদেনের ভিত্তিতে। শ্রমিক

নেতাদের সে ভাবেই বশ করতেন। যাকে এখন বলা হচ্ছে রাজনৈতিক ঘুষের প্রচলন তিনি করেছিলেন বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে। ছোটখাটো চুরিচামারির কথা শুনলে তিনি রসিকতা করে বলতেন, ন্যাশনাল ক্যাপিটাল ফর্ম করছে!

এসব প্রশ্ন উঠবে রাজনৈতিক শিষ্ঠাচারের প্রশ্নে। জননেতা ও রাজনীতিবিদের মধ্যে তফাৎ থাকবে। তিনি অসামরিক হতে গিয়ে প্রাসাদ রাজনীতি করেছেন। ভুল সিদ্ধান্তও নিয়েছেন। এসব রাজনীতির অংশ। কিন্তু আজ তার নাম আমরা এখানে বড় করে নিচ্ছি, বড় অক্ষরে লিখতে চাইছি সততার প্রশ্নে। এখন আমাদের রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল প্রক্রিয়া যা দাঁড়িয়েছে তাতে প্রশ্ন বড় হয়েই আসছে। এখন ছাত্র রাজনীতির স্রোত প্রায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কারণ হিসেবে একজন নেতা বললেন, আত্মত্যাগী নেতা হয়ে তো লাভ নাই, নেতৃত্বে যেতে বা মনোনয়ন পেতে গেলে, ভোটে দাঁড়াতে গেলে যে টাকা লাগে সেটা জোগাড় হবে কোত্থেকে?

এখন রাজনীতিবিদরা দলীয় সদস্য নয়, বরং তিনি তত বড় নেতা, যিনি যতবেশি মাস্তান পোষেন অথবা কজন কোটিপতিকে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে যেতে পারেন। এই কলুষিত রাজনীতির রণক্ষেত্রে সততা বলে শব্দটি হারিয়ে গেছে।

দুটি হত্যাকান্ড বাংলাদেশের রাজনীতির চালচিত্রই আসলে বদলে দিয়েছে। তৈরি হয়েছে দুই রাজকীয় ডাইনেস্টি। দলীয় মেরুদন্ডহীন রাজনীতিবিদরা আত্মকলহের মাধ্যমে সকল ক্ষমতা ডাইনেস্টির হাতে তুলে দিয়েছে। এখন পুরো জাতি ডাইনেস্টির শাসনাধীন।

সে জন্যেই জেনারেল জিয়াকে স্মরণ করছি। কারণ ডাইনেস্টি উত্তরাধিকারীর সীলমোহর নিয়ে শাসনে এসেছে, এখনো পিতৃপুরুষের সিল মেরে চলছে।

আবার ফিরে যাওয়া যাক জিয়ার কথায়।

জিয়া তার রাজনৈতিক সঙ্গী, অনুচরদের কারণে বিতর্কিত হলেও আত্মীয়দের কারণে কখনো নিন্দিত হননি। এর কারণও আছে। শৈশবেই তিনি চলে গিয়েছিলেন করাচিতে। সেখানেই বড় হয়ে ওঠায় আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তেমন একটা যোগাযোগ ছিল না। কিছু সাক্ষাৎ ও যোগাযাগ হয়েছে শুধু বাবা মমতাজুর রহমানের সঙ্গে। এই ক্ষীণ যোগাযোগ প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হবার পর। রাষ্ট্রপতি হবার পর সেই যোগাযোগও বন্ধ হয়ে যায়। কোনো রকম অভিযোগ বা সমালোচনা ভয় করতেন জিয়ার আত্মীয়স্বজনরা জিয়ার কারণেই। এ কারণেই জিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের

মৃত্যুর পর দেখা গেল ‘ছাদহীন’ নিঃস্ব জিয়া পরিবার। দুই সন্তানসহ অসহায় খালেদা জিয়া। সম্বল শুধু লক্ষ জনতার ভালোবাসা আর জিয়ার রেখে যাওয়া অসম্ভব মূল্যবান এক সীলমোহর। ব্যক্তি সততার সীলমোহর। বাইশ বছর ধরে এই মোহরটি ব্যবহৃত হচ্ছে।
এখন মাথার ওপর অসংখ্য ছাদ।
জিয়া ছিলেন অতি সাধারণ জীবনে বিশ্বাসী। অথচ তার উত্তরসূরিরা?

কথা তার আত্মীয়রা কখনো প্রকাশ করতে পারেননি। জিয়ার মৃত্যুর পর তাই যখন নিকটাত্মীয়দের বিভিন্ন স্মৃতির বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় তখন সবাই অনেক আগের কথা টুকরো টুকরো করে বলেছিলেন। নিকটাত্মীয়স্বজনের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে পারেননি বলে মৃত্যুর কিছুদিন আগে আক্ষেপ করেছিলেন জিয়া। বলেছিলেন, ‘আমি তো কিছুই করতে পারলাম না, মাথার ছাদটুকু পর্যন্ত না।’

মৃত্যুর পর দেখা গেল ‘ছাদহীন’ নিঃস্ব জিয়া পরিবার। দুই সন্তানসহ অসহায় খালেদা জিয়া। সম্বল শুধু লক্ষ জনতার ভালোবাসা আর জিয়ার রেখে যাওয়া অসম্ভব মূল্যবান এক সীলমোহর। ব্যক্তি সততার সীলমোহর। বাইশ বছর ধরে এই মোহরটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

এখন মাথার ওপর অসংখ্য ছাদ।

জিয়া ছিলেন অতি সাধারণ জীবনে বিশ্বাসী। অথচ তার উত্তরসূরিরা? নব্বইয়ের আন্দোলনে খালেদা জিয়া ছিলেন আপোসহীন। আর একানব্বইয়ের প্রধানমন্ত্রীর বেশভূষা জননেত্রী থেকে পালটে গেল কেন? এটা কি খুব প্রয়োজন ছিল। জিয়ার আত্মীয়রা কোনোদিনও তদবিরের সাহসই করতেন না আর এখন সাইদ ইস্কান্দার, মামুন, তুহিন নামগুলো শুনলে কেন রক্তশূন্য হয়ে ওঠে সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের মুখ? চায়না সফরে তারেক জিয়ার বন্ধু কিভাবে ‘মহামান্য’ রাষ্ট্রীয় অতিথি হন? কোকো কিভাবে বিসিবি’র সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দেশের বাইরে পরিচিত হয়ে ওঠেন?

হাওয়া ভবন ছিল প্রশংসিত নির্বাচনের আগে। বিশাল সাফল্যের পর বদলে গেল তার চরিত্র। ভারতের আউটলুক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হলো প্রতিবেদন। হাওয়া ভবনের সুপারিশ ছাড়া কোনো বড় ব্যবসা এখন অসম্ভব। প্রতিবাদ হয়নি হাওয়া ভবন থেকে। জিয়ার সততা, সাহস একটি জাতির নির্দেশিকা হতে পারতো। তার সন্তানদের হাতে কিভাবে কলুষিত হচ্ছে এটা জনগণ দেখছে।

সত্য মিথ্যার উর্ধ্বে প্রতিটি জাতির জন্য কিছু কিংবদন্তি লোক থাকে যারা সে জাতির সম্পদ, চালিকাশক্তি। আমরা মুক্তিযুদ্ধকে বিতর্কে ফেলে বিবর্ণ করেছি, যোদ্ধাদের অবনত করেছি, একদল শেখ মুজিবের বিশাল সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের কথা এক কথায় উড়িয়ে দেই এবং স্বীকার করি মেজর জিয়াকে।

এদের সঙ্গে সঙ্গে যেন ‘হত্যা’ হয়েছে সততা, আত্মত্যাগ বলে শব্দগুলো। টাকার কাছে পরাজিত রাজনীতি। আর যখন পরাজিত হয় জিয়া পরিবার বা তাদের হাতে ‘হত্যা’ হয় পিতার ভাবমূর্তি, তখন আক্ষেপের শেষ থাকে না।

জিয়ার উত্তরাধিকারীরা শাসন করে হাওয়া থেকে ধরা তলে। দাঁড়াতে পারে না পিতার সত্যিকারের উত্তরাধিকারিত্বে। পারে না বাংলাদেশের ‘নিয়তিকে’ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতে।

যা এ মুহূর্তে খুবই প্রয়োজন।

জিয়া পরিবার এখন হারিয়ে ফেলছে জিয়ার সেই সীলমোহরের উজ্জ্বলতা।